সরেজমিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চাহিদা নিরূপণ রিপোর্ট

('৭১-এ ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন প্রকল্প)

পর্যবেক্ষকগণ	ঃ	শাহীন আক্তার (ট্রেইনিং ইউনিট, আসক) এবং শাহ্‌ মোঃ মুশফিকুর রহমান (কমিউনিকেশন ইউনিট, আসক)
সরেজমিন পর্যবেক্ষণের সময়কাল	ঃ	১৯ নভেম্বর ২০০৪ – ২৬ নভেম্বর ২০০৪
পর্যবেক্ষণের স্থান	ঃ	যশোর এবং সাতক্ষীরা
উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্প নির্ধারিত যশোর জেলার তিনজন ও সাতক্ষীরা জেলার একজন ক্ষতিগ্রস্ত নারীর বর্তমান পারিবারিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসংগ্রহ। এই তথ্যের ভিত্তিতে তাদের চাহিদা নিরূপন ও স্থায়ী কোনো আয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে স্কীম প্রণয়ন।
রিপোর্ট প্রদানের তারিখ	ঃ	২ ডিসেম্বর ২০০৪

পূর্ব প্রস্তুতি

আমরা ফিল্ড ভিজিট ও স্কিম প্রণয়নের পূর্বে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফিল্ড ভিজিটের সাথেই কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করেছি। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি ব্যাংক ও পোস্ট অফিসে গিয়ে তাদের বিভিন্ন ধরনের ডিপোজিট, সঞ্চয়পত্র, স্কীম সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করা এবং আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগী সংগঠন চিহ্নিত করে তাদের সাহায্য নিশ্চিত করা।

ব্যাংকঃ

ঢাকার ফকিরেরপুলে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের ব্র্যাঞ্চ-ম্যানেজার আমাদের জানিয়েছেন যে, গত কয়েক বছরের অর্থনৈতিক প্রবণতা হচ্ছে ক্রমাগত হারে সাধারণ সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ের ওপর সুদের হার কমে যাওয়া। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সুদ দেয়া হচ্ছে ফিক্সড ডিপোজিট স্কীমে। সুদের হার ৬.৪%। এই ডিপোজিট থেকে ছয়মাস অন্তর টাকা উত্তোলন করা যাবে, তার আগে নয়। তিনি হিসেব করে দেখান ৭০,০০০ টাকা রাখলে ছয়মাসে একাউন্ট হোল্ডার সুদ তুলতে পারবেন প্রায় হাজার দু'য়েক টাকার মতো।

পোস্ট অফিসঃ

যশোর ও সাতক্ষীরার মূল পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, তাদের স্কীমগুলোর সুদের হার ব্যাংকের তুলনায় বেশী, যদিও কিছুদিন পরপর সরকার থেকে সুদের হার কমিয়ে দেয়ার প্রবণতাটা এক্ষেত্রেও বিদ্যমান। এখানে তিনটি স্কীম আছে যার একটি শুধুমাত্র পেনশন হোল্ডারদের জন্যই প্রযোজ্য। অপর দু'টি নিচে বর্ণিত হলো–

১. তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র– এই সঞ্চয়পত্রের বিপরীতে ১০% হারে সুদ প্রদান করা হয়। অর্জিত সুদ তিনমাস অন্তর উত্তোলন করা যায়। তবে সর্বনিম্ন এক লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র কিনতে হয়। হিসাবটা দাঁড়াচ্ছে এমন– এক লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র নিলে প্রতি তিনমাস অন্তর ২,৫০০ টাকা উত্তোলন করা সম্ভব।

২. মেয়াদী হিসাব– মেয়াদ তিন ধরনের হতে পারে, এক বছর, দুই বছর বা তিন বছর। মেয়াদের পূর্বে টাকা উত্তোলন করতে চাইলে সুদ অনেক কমে যায়। তবে এই স্কীমে যেকোনো অংকের টাকা জমা রাখা যায়। হিসাবটা দাঁড়াচ্ছে এমন–

এক বছর মেয়াদী হিসাবে সুদ ৯.৫%, অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকায় আসে ৯,৫০০/-
দুই বছর মেয়াদী হিসাবে সুদ ১০.৫%, অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকায় আসে ২১,০০০/-
তিন বছর মেয়াদী হিসাবে সুদ ১১.৫%, অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকায় আসে ৩৪,৫০০/-

প্রকল্প বাস্তবায়ন সহযোগীঃ

এনজিওদের মধ্যে *বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (বাস্ট)* আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অন্যতম। প্রথমেই আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, যশোর শহরে বাস্টের শাখা অফিস রয়েছে। আমরা বাস্টের মূল অফিসের সাথে মৌখিকভাবে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতা কামনা করি এবং সেইসাথে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠিও প্রদান করা হয়। এর প্রেক্ষিতে বাস্টের ফরিদা আখতার যশোরের বাস্ট অফিসকে ফোন করে আমাদের সহযোগিতা করতে বলেন। একইসাথে তিনি বাস্টের যশোর শাখাকে সেই মর্মে একটি অফিসিয়াল চিঠিও প্রদান করেন, যা আমরা সাথে করে যশোর নিয়ে যাই। ফরিদা আখতারের পরামর্শেই আমরা সাতক্ষীরাতে *নিজ অধিকার* নামক একটি মানবাধিকার এনজিওকে সেখানকার সহযোগী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করি।

প্রতিবন্ধকতা

তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবন্ধকতাটি ছিল আমাদের ব্যাপারে স্থানীয় লোকজনের অতিরিক্ত আগ্রহ। হালিমা পারভীন ব্যতীত অন্য সবার ক্ষেত্রেই আমাদের কমবেশি এই সমস্যাটা মোকাবিলা করতে হয়েছে। রোকেয়া খাতুনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটি সমস্যা ছিল যে, আমাদের চারপাশ ঘিরে ছিল তার তিন সৎ ছেলে ও সতীন।

আমরা একাধিকবার ভিজিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে সারভাইভারের সাথে কথা বলার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। যেমন রোকেয়া খাতুনকে দ্বিতীয় দিন ভিজিটের সময় তার সতীন আশেপাশে থাকলেও সৎ ছেলেদের কেউ ছিল না। বস্তিতে থাকেন বলে জোলেখা বিবির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কাজ করেনি। তাই তাকে আমরা বস্তি থেকে আমাদের হোটেল কক্ষে নিয়ে এসে যথেষ্ট সময় নিয়ে কথাবার্তা বলি। এতে সমস্যাটা অনেকখানি এড়ানো গেছে।

আরেকটা বিশেষ সমস্যা ছিল যে, সারভাইভারগণ তাদের আর্থিক সংগতি বা আয়ের উৎস সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমাদেরজানাতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। স্বচ্ছলতার আভাস পেলে অনুদান নাও পাওয়া যেতে পারে– এই আশংকা তাদের ঘিরে ছিল। আমরা তাদের এই মর্মে আশ্বস্ত করি যে, তাদের জন্য বরাদ্দ করা টাকা তাদেরকেই দেয়া হবে এবং অনুদানপ্রাপ্তদের তালিকা পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এছাড়া সঠিক তথ্য অনুসন্ধানে আরেকটি বিষয়ও বেশ কাজে আসে। যশোরের তিনজন সারভাইভার পরস্পরের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং কিছু অনাকাঙ্খিত বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে শত্রুভাবাপন্নতা জন্মেছে। ফলে তারাই একে অপরের বিষয়ে অনেক তথ্য প্রদান করেছেন, যার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ক্রসচেক করা গেছে।

যেভাবে প্রস্তাবিত স্কীম চিহ্নিত ও তার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে

আমরা প্রাথমিকভাবে যথাসম্ভব অধিক তথ্য আহরণ করার চেষ্টা করেছি। আমাদের আহরিত তথ্যগুলোকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়– একটি হচ্ছে অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত, অপরটিতে প্রাধান্য পেয়েছে বিভিন্ন সামাজিক দিক।

অর্থনৈতিক অংশে রয়েছে–

- সারভাইভারের পেশা
- স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ
- আয়ের বিভিন্ন উৎস
- ব্যয়ের বিভিন্ন খাত
- কোনো বিশেষ কাজে দক্ষতা
- স্থানীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সেই কাঠামোয় সারভাইভারের অবস্থান
- অন্যকোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও সে অনুদান ব্যবহারের খতিয়ান
- আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা
- নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য আহরণ।

সামাজিক অংশে রয়েছে–

- পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের বিবরণ
- তাদের সাথে সারভাইভারের সম্পর্ক এবং পারিবারিক পরিমণ্ডলে তার অবস্থান
- প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক ও তার সামাজিক মর্যাদা
- সম্ভাব্য উত্তরাধিকার
- আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নিকটাত্মীয়দের চিন্তাভাবনা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা
- সারভাইভারের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য
- যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি স্বীকৃতি এবং সেই স্বীকৃতির সামাজিক প্রতিক্রিয়া
- পূর্বের কোনো অনুদান প্রাপ্তির সামাজিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য আহরণ।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সারভাইভারের কাছ থেকে অনুদান ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষেত্র সম্পর্কে তার নিজের চিন্তা-ভাবনা জানতে চেয়েছি এবং প্রয়োজন অনুসারে আহরিত তথ্যের ভিত্তিতে নিজেদের থেকে কিছু ইনপুট দিয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপযোগিতা নিয়ে তার সাথে বিস্তারিত পরামর্শ করেছি। ক্ষেত্র বিশেষে নিজেরাও অনুদানের সম্ভাব্য ব্যবহার বিষয়ে কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করে তার উপযোগিতা নিয়ে সারভাইভারের সাথে পরামর্শ করেছি। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সহযোগীরাও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া

বিভিন্ন প্রস্তাব যাচাই-বাছাইয়ের পর পছন্দসই এক বা একাধিক স্কীম বিবেচনায় নিয়ে সামর্থ্যবান সারভাইভারের ক্ষেত্রে তাকেই সেই স্কীম সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কাজ করতে অনুরোধ করেছি। যেমন জমি ক্রয় বা বন্ধকের ক্ষেত্রে তাদেরকেই জমি চিহ্নিতকরণ ও প্রাথমিক কথাবার্তা বলতে বলেছি। পরবর্তীতে স্থানীয় সহযোগী সংগঠনের সাথে তারা যোগাযোগ করে স্কীমটি চূড়ান্ত করে আমাদের জানাবেন। সামর্থ্য নেই এমন সারভাইভারের ক্ষেত্রে স্থানীয় সহযোগী সংগঠনকেই সব কাজ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জমি সংক্রান্ত স্কীমের ব্যাপারে সহযোগী সংগঠন যে কাজটি করবে তা হচ্ছে, সংশিষ্ট জমির বর্তমান মালিকানার নিস্কন্টকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, নতুন দলিলপত্র তৈরির আইনগত দিক তত্ত্বাবধান করা এবং পরবর্তীতে ফলো-আপ করা। দু'টি সহযোগী সংগঠনের কন্টাক্ট পার্সন্‌ই আইনজীবী হওয়ায় তাদের পক্ষে এই কাজটা করা সম্ভব হবে।

নাম: হালিমা পারভীন
বয়স: ৪৭ (আনুমানিক)
ঠিকানা: মুরালি, খাঁ পাড়া, যশোর
লোকেশন: মুরলির মোড় থেকে হাঁটাপথ। এখানে এসে মুক্তিযোদ্ধা হালিমা পারভীনের কথা বললে স্থানীয় লোকজন দেখিয়ে দেবে।

সাধারণ আলোচনাঃ
হালিমা পারভীন চরিত্রগতভাবে সংগ্রামী, জেদী এবং আত্মবিশ্বাসী। তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং এখনো করছেন। পরিবারের ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সরকারি চাকরি করেন। সব মিলিয়ে হালিমা পারভীনের ক্ষেত্রে স্কীম বাছাই-এ তার নিজের মতামতের ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখা যায়।

পরিবারের বিবরণঃ
স্বামী আতিয়ার রহমান (৪৯) ও ছোট ছেলে নাজমুল আলম (১৪) কে নিয়ে হালিমা পারভীনের সংসার। স্বামী বেকার। ছেলে রাইফেল্‌স্ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে।

আত্মীয়-স্বজনের বিবরণঃ
হালিমার বাবার দিককার প্রচুর আত্মীয়-স্বজন থাকা স্বত্ত্বেও তাদের কারও সাথেই তেমন যোগাযোগ নেই। অপর দিকে হালিমাকে বিয়ে করায় আতিয়ারকে তার পিতা ‘ত্যাজ্য’ করে। তবে এক ভাইয়ের সাথে আতিয়ারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক এখনও রয়েছে।

হালিমার বড় মেয়ে– লুবনা সুলতানা (২২), উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ছে। সাত-আট বছর আগে তার বিয়ে হয়ে যায়। তার স্বামী কালীগঞ্জ হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার।

হালিমার দেবর– আব্দুস সাত্তার মণিরামপুরের খেদাপাড়ায় তহসিলদারের কাজ করে। বেশ স্বচ্ছল। এই দেবর হালিমার সাথে তাদের বর্তমান দুই ইউনিটের বাড়িতে বসবাস করে।

প্রতিবেশী/পরিপার্শ্বঃ
মুরালি এলাকাটা যশোর শহরের মধ্যে বলেই ধরা হয়। এখানকার জমির দাম অনেক। ব্যবসা-বাণিজ্যও জমজমাট। তাই এখানে মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোকেরাই বসবাস করেন । প্রতিবেশীদের সাথে হালিমার যথেষ্ট সুসম্পর্ক রয়েছে বলে তিনি আমাদের জানিয়েছেন। কেবল পাশের বাড়ির সাথে জমিজমার বিরোধ নিয়ে একাধিক মামলা-মোকদ্দমা চলছে।

সম্পত্তিঃ
মুরালিতে হালিমা নিজের পাকা বাড়িতে থাকেন। দেবরের সাথে সমান শেয়ারের ভিত্তিতে তিনি চার কাটার এই জমি কিনে (১ কাটা রাস্তার জমিসহ) তার আড়াই কাঠার ওপর বর্তমান বাড়িটি তৈরি করেছেন। বাড়িটি দুই ইউনিটের। দেবর প্রায়ই থাকেন না। তবে ভাড়াও হয়না। তাই প্রায় পুরো বাড়িটাই হালিমারা ব্যবহার করেন। তার বাড়িতে টিভি, সোফা ইত্যাদি মধ্যবিত্ত পরিবারের চাহিদানুরূপ সব প্রয়োজনীয় উপকরণই রয়েছে।

আয়ের উৎসঃ

হালিমা যশোরের বক্ষব্যাধি হাসপাতালে আয়ার কাজ করেন। সরকারি চাকরি। বেসিক ২,৪০০/- টাকা। বাড়ি তৈরির জন্য অফিস থেকে তিনবার টাকা তুলেছিলেন (১৩,০০০/-, ২১,০০০/- ও ৩৫,০০০/-)। দ্বিতীয় ঋণটির শেষ কিস্তি গত মাসে (অক্টোবর ২০০৪) শোধ হয়েছে। অন্য দু'টোর কিস্তি বেতন থেকে কেটে রাখা হয়। সব মিলিয়ে বর্তমান মাসিক বেতন ৩,৭৮৩/- টাকা। দুই ঈদে বোনাস আছে, চাকরি শেষে পেনশন ছাড়াও এককালীন চার লাখ টাকার মতো পাবেন। হালিমার স্বামী কোনো চাকরি না করলেও বক্ষব্যাধি হাসপাতাল সংলগ্ন পাঁচ কাটা জমিতে সবজি চাষ করেন। তা থেকে পরিবারের সবজির চাহিদা মেটে।

বিশেষ কোনো কাজে দক্ষতাঃ

স্বামী আতিয়ারের চিকিৎসা সহায়তার ওপর ছয় মাসের একটা ট্রেনিং কোর্স করা আছে (LMAFP & G)। এটিও নেয়া হয়েছে বছর তিনেক আগে। ওষুধপত্রের নাম জানেন, স্যালাইন দেয়া, ইনজেকশন দেয়া, প্রেশার মাপা ইত্যাদি কাজ করতে পারেন। আগে অন্যের ওষুধের দোকানে বসে চর্চা করতেন, তবে আয় তেমন হতো না।
আরেকটি উলে-খযোগ্য দক্ষতা হলো আতিয়ার অনেক বছর ধরেই নিজ হাতে সবজি চাষ করছেন ফলে এ বিষয়ে তার পারদর্শীতা প্রমাণিত।

অন্যকোনো স্বীকৃতি বা অনুদানঃ

হালিমা অনেক সরকারি ও বেসরকারি স্বীকৃতি পেয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এযাবত প্রণীত সকল তালিকাতেই তার নাম রয়েছে বলে তিনি জানালেন। সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রণ পান। এছাড়া ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। নিজের পরিচয়ে তিনি গর্ববোধ করেন। এইসব স্বীকৃতির তেমন নেতিবাচক সামাজিক প্রতিক্রিয়া নেই। তবে অন্য দুই সারভাইভার ফাতেমা খাতুন ও রোকেয়া খাতুনের সাথে প্রশিকার দেয়া সংবর্ধনা ও অনুদান নিয়ে তার কিছু অনাকাঙ্খিত ও তিক্ত ঘটনা ঘটেছে, যা অনেকদূর গড়িয়েছে।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি হালিমাকে প্রায় ২৫,০০০/- টাকা সম্মানী দিয়েছে।

এছাড়া আসাদুল করিম নামে কুষ্টিয়ায় বসবাসকারী এক মুক্তিযোদ্ধা তাকে প্রতি রোজার ঈদে ২,০০০/- টাকা ও একটি করে শাড়ি উপহার দেন। এছাড়া হালিমার ছেলের পড়াশোনার খরচ বাবদ দুবার তিনি ৫০০/- টাকা করে দিয়েছেন।

সামাজিক অবস্থাঃ

সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও হালিমা মধ্যবিত্তের জীবন যাপন করেন। এলাকার এবং প্রশাসনের লোকজন তাকে যথেষ্ট সম্মান করে।

শারীরিক অবস্থাঃ

হাইপোথাইরয়েড নামক শারীরিক সমস্যা রয়েছে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসরণ বেশি হয়। হাঁটুতে ব্যথা হয় এবং পুরো শরীর হঠাৎ করেই অবশ হয়ে যায়।

প্রস্তাবিত স্কীমঃ

এসএএম হুসাইনের আগের তৈরি করা রিপোর্টটিতে ওষুধেল দোকানকে এবং রাখি মালের ব্যবসাকে দুটি স্কীম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু হালিমা ও তার স্বামীর সাথে কথা বলে দুটি প্রস্তাবকেই আমাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে এবং তারাও একই মত পোষণ করেছেন। হালিমা পারভীনের জন্য প্রস্তাবিত অপর দুটি স্কীম নিচে বর্ণনা করা হলো–

প্রথম প্রস্তাব– হালিমা তার ছেলের চোখের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত এবং আঠারো বছর পূর্ণ হলে তার LASIK করাতে চান। তার ধারনা এতে ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা ব্যয় হবে। সেই বিবেচনায় তিনি দৃষ্টিপাতের দেয়া টাকাটা ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে রাখতে চান, যাতে ছেলের চোখ অপারেশনে কাজে লাগাতে পারেন।

বিশে-ষণ– LASIK করাতে সম্ভবত এতো টাকা প্রয়োজন হয়না এবং বর্তমানে তা দেশের অভ্যন্তরেই সম্ভব। এ সম্পর্কিত প্রামান্য তথ্য আমরা হালিমা পারভীনকে জানিয়ে আশ্বস্ত করতে পারি। এছাড়া যেহেতু তার যথেষ্ট আর্থিক নিরাপত্তা রয়েছে (পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড), তাই চলমান মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতির কথা চিন্তা করে টাকাটা আয় বর্ধনমূলক খাতে ব্যয় করাটা হয়তো বেশি বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব– স্বামী-স্ত্রী দুজনই যে বিকল্প স্কীমটির উলে-খ করেছেন, সেটা হচ্ছে জমি বন্ধক নিয়ে তাতে চাষাবাদ করা। নির্ধারিত টাকায় দুই বিঘা জমি বন্ধক নেয়া যাবে। এক বিঘা জমিতে ২৫ মণের মতো ধান উৎপাদন হয়, দুই ফসলে হয় ৫০ মণ। অর্থাৎ দুই বিঘায় মোট উৎপাদন ১০০ মণ। বর্গায় দিলে এর অর্ধেক পাবে চাষী, বাকি অর্ধেক যাবে বন্ধকগ্রহীতার কাছে।

সুবিধা– আতিয়ারের চাষাবাদের অভিজ্ঞতা আছে। এছাড়া প্রস্তাবিত বন্ধকী জমিতে ধানের বদলে শাক-সবজি চাষ করলে লাভ বহুগুণ বেশি হবে। এতে তার কর্মহীনতার সামাজিক সমস্যাটিও ঘুচবে।

অসুবিধা– সমস্যা হচ্ছে বন্ধক চিরন্তন কোনো ব্যবস্থা নয়। দুই বছর পর বন্ধক দাতা টাকা ফেরত দিয়ে জমি ছাড়িয়ে নিতে পারেন। ক্যাশ টাকা হাতে আসলে তা বিভিন্ন স্বল্প প্রয়োজনীয় কাজেই খরচ হয়ে যেতে পারে।

নাম: রোকেয়া খাতুন
বয়স: ৫১
ঠিকানা: ডাংপাড়া, মালঞ্চি গ্রাম, নারকেলবাড়িয়া, বাঘারপাড়া, যশোর।
লোকেশন: যশোরের মনিহার বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে করে বাঘারপাড়ায় পৌঁছা যায় ১২ টাকা ভাড়ায় (২৫ কিলোমিটারের মতো পথ)। বাঘারপাড়া থেকে সোজা রাস্তা ধরে তিন-চার কিলোমিটারের মতো গেলে ডানপাশে পড়বে মালঞ্চি গ্রাম। সেখানে ওহেদ কারিকরের বাড়ি বললে লোকে চিনিয়ে দেবে।

সাধারণ আলোচনাঃ
আমাদের পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে যে, রোকেয়া খাতুন শারীরিক, মানসিক কোনোভাবেই নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে সক্ষম নন। তাকে সতীন এবং তার চার ছেলের সাথে থাকতে হয়। ভবিষ্যতে ওহেদ আলীর উত্তরাধিকার ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও রোকেয়া বেগমের তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাই তার পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়াতে আমাদের হয়তো প্রক্রিয়াটির একেবারে শেষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকতে হতে পারে।

পরিবারের বিবরণঃ
রোকেয়া, তার স্বামী ওহেদ আলী (৬০) ও ছোট মেয়ে নাজমা বেগমকে (২০) নিয়ে বসবাস করেন। ছোট মেয়ে HSC-তে পড়ছে। তবে তার বিয়ের ব্যাপারে পিতা-মাতা ও সৎ ভাইয়েরা সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করছে।

আত্মীয়-স্বজনঃ
রোকেয়া বেগমের দুই মেয়ে। মাস ছয়েক আগে HSC-তে পড়াকালীন সময়ে বড় মেয়ে রাশিদা খাতুনের (২২) বিয়ে হয়। জামাইয়ের পরিবার বড় গেরস্থ।

সতীন– আনোয়ারা বেগম (৫৫) সম্পর্কে রোকেয়ার চাচাতো বোন। দুই সতীন একই ভিটায় তবে আলাদা ঘরে থাকে। রান্নাঘর, জমি-জমা, কাজকর্ম সবই আলাদাভাবে হয়।

চার ছেলে (সৎ)– মফিজুল (৩৩), জুলফিকার (৩১), খায়রুল (২৫), আয়নাল (১৭) প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান। তারা চাষাবাদের কাজ করে। এর মধ্যে জুলফিকার বিয়ে করেছে। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান একই ভিটায় থাকে।

উলে-খ্য, যুদ্ধের পর ওহেদ আলী রোকেয়া খাতুনকে বিয়ে করলে বড় বউ রাগ করে পিতার বাড়িতে গিয়ে ওঠে। বহুদিন তারা সেখানেই ছিল। গত পাঁচ-সাত বছর হয় তারা ওহেদ আলীর ভিটায় ফিরে এসেছে।

সম্পত্তিঃ
ওহেদ আলী ৩০ বছর আছে পিতৃভিটা বিক্রি করে শ্বশুরালয়ের পাশে বর্তমান ২০ কাঠা পরিমাণের ভিটার জমিটি কেনেন। তিনি '৮৮-এর বন্যার সময় ১২,০০০/- টাকা ঋণ নেন, যা শোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। ছেলেরা এই ঋণ শোধ করে দিলে তিনি ভিটার এগারো কাঠা জমি চার ছেলে ও বড় স্ত্রীকে লিখিতভাবে দান করে দেন (যদিও টাকার পরিমাণ ও জমির মূল্যের ব্যাপারটি সাদা চোখে তেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হচ্ছে না)। পরবর্তীতে তিনি বাকি নয় কাঠা জমি চার ছেলে ও দুই মেয়েকে সমানভাগে ভাগ করে দান করে দেন। অর্থাৎ আইনগতভাবে বর্তমান ভিটায় ওহেদ আলীর কোনো অধিকার নেই, রোকেয়ারও না।

অপরদিকে ওহেদ আলীর নিজের চাষযোগ্য জমি নেই। প্রথম স্ত্রীর রয়েছে ৩০ কাঠা ধানী জমি। রোকেয়ার রয়েছে আড়াই কাঠা। সেটা ওহেদ আলী নিজেই চাষ করেন, ছেলেদের সাহায্য নিয়ে।

যে ঘরটায় রোকেয়া থাকেন তার আয়তন হবে ১২ হাত × ৫ হাত। রান্না ঘরটি হচ্ছে ৬ হাত × ৩ হাত। ভিটায় অল্প সব্জি চাষ করেন। এক বছরের একটা এঁড়ে বাছুর ও ৪ টা মুরগী তাদের আছে। সেইসাথে ২০ কাঠা জমি বন্ধক নিয়ে চাষবাষ করছেন ছেলেদের সহযোগিতায়।

অর্থনৈতিক কাজে দক্ষতা/অভিজ্ঞতাঃ
রোকেয়া খাতুন পাটালী গুড় তৈরি করতে পারেন। ভিটার ওপর চার গণ্ডা খেজুর গাছ আছে। ওহেদ আলী নিজেই গাছ কাটেন। তবে তা থেকে আয় তেমন হয় না।

অন্যকোনো স্বীকৃতি বা অনুদানঃ
রোকেয়া একাধিকবার সরকারি-বেসরকারি স্বীকৃতি ও সম্মানী পেয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সংবর্ধনা ও ২৫,০০০/- টাকার সম্মানী, প্রশিকার এ বছর দেয়া ২০,০০০/- টাকা, গত আওয়ামী লীগ আমলের শেষ দিকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পাওয়া ১২ শিট টিন। এছাড়া এলাকার ডিসি প্রতিবছর ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর একটি করে শাড়ী উপহার দেন।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পূর্ব-অভিজ্ঞতাঃ
ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির দেয়া ২৫,০০০/- টাকা খরচের খাতগুলো নিম্নরূপ–

১০ কাঠা জমি বন্ধক–	৭,০০০/- টাকা
চিকিৎসা খরচ– (গাড়ীর ধাক্কায় ওহেদ আলী আহত হলে)	১০,০০০/- টাকা
ছোট মেয়ের এসএসসি– পরীক্ষার ফি–	১,২০০/- টাকা
বাকি টাকা খাওয়া-দাওয়ায় খরচ হয়ে যায়	

প্রশিকার প্রদত্ত ২৫,০০০/- টাকা সাথে স্থানীয়ভাবে গৃহীত ১০,০০০/- টাকা ঋণ খরচের বিবরণ নিম্নরূপ–

এঁড়ে বাছুর ক্রয়–	২,৫৬০/- টাকা
ঘর মেরামত–	৭-৮,০০০/- টাকা
১০ কাঠা জমি বন্ধক–	৬,০০০/- টাকা
চিকিৎসা খরচ– (রোকেয়ার পেটের টিউমার অপসারণ বাবদ)	১০,০০০/- টাকা
মেয়ের বিয়েতে খরচ–	১৫,০০০/- টাকা

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রাপ্ত ১২ শিট টিনের ৯টা থাকার ঘরে লাগিয়েছেন, ৩টা গোয়াল ঘরে দিয়েছেন।

সামাজিক অবস্থানঃ
রোকেয়ার সৎ ছেলেদের সামাজিক অবস্থান বেশ ভালোই মনে হলো। তবে রোকেয়া খাতুন নিজে একটু নমনীয় প্রকৃতির। সব মিলিয়ে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে রোকেয়ার অবস্থানের চেয়ে নিজের পরিবারে তার অবস্থান বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তার সৎ বড় ছেলে এবং স্বামীই আমাদের সাথে বেশি কথা বলছিল। এর বাইরে কোনো কিছু বলার সাধ্য বা উপায় তার ছিল বলে মনে হচ্ছিল না।

শারীরিক অবস্থাঃ
গত কিছুদিন আগে তার পেট থেকে টিউমার অপারেশন করা হয়েছে। শারীরিকভাবে তাকে ভীষণ দুর্বল বলে মনে হয়েছে। প্রতিদিনই ওষুধ খেতে হয়। মাসে ওষুধ বাবদ ২২৫/- টাকা খরচ বলে তার স্বামী আমাদের জানান।

প্রস্তাবিত স্কীমঃ
রোকেয়া বেগমের স্বামী ও সৎ ছেলেদের সাথে পরামর্শ করে নিম্নোক্ত স্কীমগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে–

প্রথম প্রস্তাব– ওহেদ আলীর চিন্তা হচ্ছে, প্রাপ্ত টাকা দিয়ে একটা গাভী কিনলে ও দুই বিঘা জমি বন্ধক নিলে তা সবচেয়ে বেশি লাভজনক হবে।

সুবিধা– তাদের ইতোমধ্যেই গাভী পালন ও বন্ধকী জমি ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

অসুবিধা– বন্ধকী জমির টাকা ফেরত পাওয়ার পর তার নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া চাষবাষের দিকটা মূলত ছেলেরাই দেখাশোনা করে এবং ছেলেদের সামনে ওহেদ আলীকে মানসিকভাবে যথেষ্ট ক্ষীণবল বলে মনে হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব– ভিটার পাশেই একটা বেশ ভালো উচুঁ জমি রয়েছে, যাতে এমনকি ভিটাও সম্প্রদারণ করা সম্ভব। এই জমিটিও কেনা যেতে পারে।

সুবিধা– এই জমি রোকেয়াকে পরিবারের কাছে মূল্যবান করে তুলবে এবং জমির নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কাও তুলনামূলকভাবে কম। তার মেয়েদের ভবিষ্যতের জন্যেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

অসুবিধা– জমির দাম বেশ চড়া। তবে ওহেদ আলী বলেছেন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি টাকা সংস্থান করা তার পক্ষে সম্ভব হবে।

রোকেয়া নিজে কোনো প্রস্তাব দিতে না পারলেও আমাদের একান্তে জানিয়েছে যে, যাই করি না কেন আমরা নিজেরা উপস্থিত থেকে পাকা কাগজপত্র করে যেন তাকে নিশ্চিত করে যাই।

বিশেষ সতর্কতাঃ
আমরা প্রতিবেশী মারফত শুনেছি পরিবারের বড় ছেলের বিদেশ যাবার চিন্তা আছে। তাই কোনোভাবেই ক্যাশ টাকা হস্তান্তর করাটা নিরাপদ নয়।